মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রধান দিকগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করো। (ব. বি. ২০০৮)

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের 'কাউন্সিল অ্যাক্ট' ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে অনেকটাই স্পষ্ট করে দিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বিভাজনের প্রয়াস সমস্ত ভারতবাসী ও রাজনৈতিক নেতাদের ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পটভূমি তৈরি করছিল। কিন্তু মুসলিম লিগের নেতাদের একগুঁয়ে মনোভাব এবং কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতাদের আপোষমুখী মনোভাব ও সংগ্রামী কর্মসূচী গ্রহণে দোদুল্যমানতা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে এক জটিল টানাপোড়েনের মধ্যে এনে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত বঙভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ফিরোজ শাহ মেহতা, গোখলে প্রমুখ নরমপন্থী নেতাদের সহজাত সংগ্রামবিমুখ মানসিকতা ও চরমপন্থীদের প্রতি বিদ্বেষ আবার ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লিগ নেতাদের হাতে ভারতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই

Scanned with CamScanner

প্রশাসনিক কথা চিন্তা করছিলেন। ১৯০৫ সালের অগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যালফুর ভারতবর্ষের বড়লাট বা ভাইসরয় নিযুক্ত করেন মিন্টোকে। ১৯০৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মিন্টো ছিলেন কানাডার মুখ্য প্রশাসক। কার্জনের শাসনে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যালফুর মিন্টোকে ভারতে পাঠান। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার কেন তত্ত্ব বা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যাস মিন্টোর ছিল না। রাজনীতির চেয়ে ঘোড়া ও রেসের মধ্যে থাকাটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশি। অমলেশ ত্রিপাঠি দেখিয়েছেন যে, বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক অশ্বটিকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় করিয়েছিলেন কার্জন, সদ্য নিযুক্ত ভাইসরয় তাকে একটু বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন।

সেই সময় ভারতের সচিব পদে ছিলেন মর্লে। উদারপন্থী পন্ডিত হিসাবে মর্লের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর আদর্শ পুরুষ ছিলেন উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোন। মর্লে রচিত গল্যাডস্টোনের জীবনচরিত প্রামাণ্য গ্রন্থের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তা ছাড়া ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসকার হিসেবেও তিনি সুনাম লাভ করেছিলেন।

ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মর্লে ও মিন্টো দু'জনেরই উল্লেখযোগ্য একটি অবদান ছিল। তদানীন্তন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার জন্য তারা কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পরবর্তী ব্রিটিশ শাসকেরা সেই নীতিগুলির বিশেষ রদবদল না করে, সেইগুলিকেই বহাল রেখেছিলেন। মর্লে ও মিন্টো নির্ধারিত নীতিগুলির তিনটি উপাদান ছিল লক্ষনীয়। নিরঙ্কুশ দমননীতি, চরমপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নরমপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং বিভেদ ও শাসন নীতির খোলাখুলি প্রয়োগ। তৃতীয়টির সেরা উদাহরণ ছিল সাম্প্রদায়িক কৌশল প্রয়োগ করে পৃথক নির্বাচক মন্ডলী গঠন।

গোখলে ১৯০৬ সালে মর্লের সঙ্গে লন্ডনে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়ে মত বিনিময় করেন। ভারতবাসীকে স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা যে মর্লের চিন্তার অতীত ছিল, তা মিন্টোকে লেখা মর্লের পত্র (২ অগস্ট, ১৯০৬ সাল) থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসে ভাঙন এবং সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষিতে মিন্টো একটি সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন করেন ১৯০৮ সালের ১ অক্টোবর। এই খসড়ায় মুসলিম সম্প্রদায়, বণিক ও জমিদার শ্রেণির স্বার্থরক্ষার পৃথক প্রয়াস নেওয়া হয়। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের জন্য আইন পরিষদে পাঁচটি আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব মর্লের মনঃপুত হয়নি। এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী এ কথা মনে করে তিনি 'মিশ্র নির্বাচকমন্ডলী'

Scanned with CamScanner

প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন। মুসলিম লিগ তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। শেষ পর্যন্ত মিন্টোর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯০৯ সালে মে মাসে 'মর্লি মিন্টো সংস্কার' আইনটি পাস হয়ে যায়। এই আইনটি 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট' নামেও পরিচিত।

১৯০৯ সালের আইনের শর্তাবলি: মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির গঠন ও ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয়।

(ক) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৬০ জন করা হয়। এদের মধ্যে অনধিক ২৮ জন সদস্য সরকার কর্তৃক সরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনীত হবেন। বেসরকারি সদস্য থাকবেন মোট ৩২ জন। এদের মধ্যে গভর্ণর জেনারেল বিশেষ বিশেষ শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য পাঁচ জনকে মনোনীত করবেন। বাকী ২৭ জনের মধ্যে নয়টি প্রাদেশিক আইন পরিষদের বেসরকারি সদস্যরা ১৩ জনকে নির্বাচন করবেন। অবশিষ্ট ১৪ জন নির্বাচিত হবেন সাতটি প্রদেশের জমিদার সম্প্রদায়, পাঁচটি প্রদেশের মুসলিম জনতা এবং কলিকাতা ও বোম্বাই এর বণিক সভা দ্বারা। এরা যথাক্রমে ছয় জন, ছয় জন ও দুই জন সদস্য অর্থাৎ মোট ১৪ জনকে নির্বাচন করবেন। বড়লাটের কার্য পরিষদের নয় জন সদস্যও আইন সভায় অংশগ্রহণ করবেম। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোট সদস্য হবেন ৬৯ জন।

(খ) প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে সর্বাধিক ৫০ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট প্রদেশগুলিতে সর্বাধিক ৩০ জন সদস্যপদ নির্দিষ্ট হয়। প্রদেশগুলিতেও বেসরকারি সদস্যদের ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বা শ্রেণিগত নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

(গ) আইন সভার নির্বাচনে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দান করা হয়।

(ঘ) আইনসভার সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বাজেটের উপর বিতর্ক এবং ছাটাই প্রস্তাব আনার অধিকার লাভ করেন।

(ঙ) বড়লাটের কার্যনির্বাহ পরিষদে (Executive Council) একজন ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্যারিষ্টার সতেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিনহা) প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই পদে যোগ দেন।

মূল্যায়ণ: ব্রিটেনের উদারপন্থী সংসদ স্যার হেনরি কটন ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনকে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি ধীর পদক্ষেপ বলে

Scanned with CamScanner

বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পীয়ারও এই আইনকে 'a major landmark in the progress of India towards self government' বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই আইন যথেষ্ট উদার ছিল না। এই আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং বড়লাটের শাসন পরিষদে এক জন ভারতীয় গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর দাবি কিছুটা পূরণের চেষ্টা করলেও এই আইন বাস্তবে ছিল অনেক বেশি ক্ষতিকরো।

সাম্প্রদায়িকতার পোষণ: ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইনে বেসরকারি সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে সরকার ভারতীয়দের প্রতারিত করতে চেয়েছেন। কারণ—(ক) এই আইনে প্রকৃত অর্থে বেসরকারি সদস্যদের ক্ষমতা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি। আইনসভাগুলিতে সরকার মনোনীত সদস্যসংখ্যা পূর্বের মতই বেসরকারি সদস্যদের তুলনায় বেশি ছিল। ফলে বেসরকারি সদস্যগণ কোনওভাবেই আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। ঐতিহাসিক ক্যুপল্যান্ড যথার্থই বলেছেন যে এই আইনে গঠিত সংসদ মধ্যযুগীয় দরবারের বেশি কিছু ছিল না। এমনকি ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল। মহিলা বা সাধারণ লোকের ভোটাধিকার ছিল। সদস্যগণ পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ফলে জনসাধারণের কাছে তাদেরও কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না; (খ) বড়লাট বা ছোটলাট আইনসভার যে কোনও কাজ বা সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। এমনকি গৃহীত আইন বাতিলও করতে পারতেন; এবং (গ) এই আইনের সর্বাধিক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকৃতিদান। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচন অধিকার স্বীকার করে নিয়ে চতুর ইংরেজ ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূলে আঘাত করে। হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক দু'টি জাতি এ কথা মেনে নিয়ে সরকার এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করেন, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য লাহোর কংগ্রেসে ১৯০৯ সালে ক্ষোভের প্রকাশ করে বলেন যে, এই আইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে বিভেদনীতিকে পুষ্ট করে ভারতীয়দের মধ্যে জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে আঘাত হানাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। তাই ১৯০৯ সালে সংস্কার আইন জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে ঠেলে দিয়েছিল। গান্ধিজি 'মর্লে মিন্টো সংস্কার' আইনকে ভারতবাসীর পক্ষে 'মৃত্যুবাণ' বলে অভিহিত করেন। এক কথায় বলা যায়, 'মর্লে মিন্টো সংস্কার' আইন ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসনের দাবি পূরণেও যেমন ব্যর্থ তেমনি চরমপন্থী মতবাদের প্রসার রোধ করতেও ব্যর্থ।

Scanned with CamScanner